শিব কুমার

বামপন্থীদের সমস্যা হল, তারা ঠিক বুঝছে না লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে

এই মুহূর্তে যাঁরা পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক, তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ এবং কুশলী। অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে তাঁদের হারানো অসম্ভব। বললেন **প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চ**। কথায় **মইদুল ইসলাম**

মইদুল ইসলাম: 'এই সময়'-এর পাঠকদের জন্য আপনি যদি আপনার বইগুলো সম্পর্কে একটু বলেন।

প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চ: আমি আমার প্রথম বই লিখতে শুরু করি যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সময়ে আমি ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড নামক এক ব্রিটিশ অনুসন্ধানকারী, সৈনিক ও পর্যটকের কিছু ঐতিহাসিক নথিপত্রের হদিস পাই। পরবর্তী জীবনে এই ইয়ংহাজব্যান্ড একজন রহস্যময় সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু ওঁর জীবনে অনেক ভালো গল্প আছে তাই ঠিক করি যে ইয়ংহাজব্যান্ড-এর জীবনী লেখা যেতেই পারে। তার পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে আমার আগ্রহ বাড়ে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেশি ছিল। তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগ নিয়ে বই লিখি যার নাম 'লিবার্টি অর ডেথ: ইন্ডিয়া'স জার্নি টু ইনডিপেনডেন্স অ্যান্ড ডিভিশন'। তার পর আমি তিব্বত নিয়ে বই লিখি যেটা ইতিহাস ও ভ্রমণকাহিনির মেলবন্ধন বলা যেতে পারে। এর পরে আমাকে এক প্রকাশক, সাহিত্যিক ভিএস নাইপলের অনুমোদিত জীবনী লিখতে বলে। এই ক্ষেত্রে আমি নাইপল সম্পর্কে কিন্তু একটা অকপট জীবনী লেখার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। তার পর আরও একটা বই লিখি যার নাম 'ইন্ডিয়া: এ পোর্ট্রেট' যেখানে আমি মূলত একটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবি। সেটা হল আর্থিক উদারীকরণের পরে ভারতে ঠিক কী রকম ফল হল এবং কোন ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা গেল? আর এখন আমি ঔপন্যাসিক ডোরিস লেসিং-এর জীবনী লিখছি। ডোরিস লেসিং হলেন একমাত্র ব্রিটিশ মহিলা যিনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন।

আপনার অনেক বই, পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের বেশ কয়েকটা জায়গা নিয়ে যেমন তিব্বত ও দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে। পূর্ব গোলার্ধের প্রতি আপনার এ হেন কৌতূহলের কারণ কী?

এখন অবশ্য মধ্য এশিয়া এবং তিব্বত নিয়ে আমার কৌতূহল কমেছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে আমি এখনও গবেষণা করি। তার একটা কারণ হল আমি ভারতে থাকি। দিল্লির বাসিন্দা। এবং সেই সূত্রে দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে আমার বরাবর আগ্রহ আছে। আমি সাম্প্রতিক বিশ্বের ইতিহাস নিয়েও এখন বেশ ভাবছি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ইউরোপ ও আমেরিকায় যা হচ্ছে। আমি ব্রিটেনে ব্রেক্সিট ভোটকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। অন্য দিকে, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী জয়কে পৃথিবীর একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বেশ দ্রুত কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে 'পপুলিজম' একটা বড়ো বিষয়। তার সঙ্গে ক্রমশ পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধ থেকে পূর্বের দিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থানান্তরের প্রক্রিয়াও আমাকে বেশ আকর্ষণ করছে।

গত কয়েক দশকের বিশ্বায়ন ভারত এবং বিশ্বে খুব চিন্তাজনক অসাম্য তৈরি করেছে। এবং এই অসাম্যকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো রাজনৈতিক বক্তব্য লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এক দিকে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ব্রেক্সিট-এর মতো রাজনৈতিক ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্য দিকে ভারতেও নরেন্দ্র মোদী কথায় কথায় গরিবদের কল্যাণের কথা জনসভায় বলছেন। বিশ্বে যখন অভূতপূর্ব অসাম্য বাড়ছে তখন বামপন্থী 'পপুলিজম'-এর থেকে দক্ষিণপন্থী 'পপুলিজম' কেন বেশি জয়ী হচ্ছে?

> অর্থনৈতিক প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও বিশেষ কিছু করেনি যা গড়পড়তা দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকের কাছে লোকে আশা করে।

এই যে পথ যেখানে এক ধরনের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 'পপুলিজম' মিশছে এবং একজন নেতা বলছেন যে কেবলমাত্র 'আমি জনগণের কণ্ঠস্বর' আর গণতান্ত্রিক শাসন চালনার ক্ষেত্রে যে অন্তর্বর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের কথা জনতা ভুলে যাচ্ছে; এই পথ তৈরির পিছনে মূল চালিকাশক্তি হল অর্থনৈতিক পরিবর্তন। এখানে দুই ধরনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। এক হল 'অটোমেশন' (স্বয়ংক্রিয়তা) যার ফলে মানুষের কাজ এখন রোবট নিয়ে নিচ্ছে এবং বেশ কিছু পেশা যেমন বাহনচালক থেকে শুরু করে লাইব্রেরিয়ান এখন প্রায় বিলুপ্ত হবার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু তার থেকেও বড়ো বিষয় হল অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হিসেবে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের তুলনায় ক্রমশ পূর্ব গোলার্ধের দিকে ঝুঁকে যাবার প্রবণতা। এই সব যুগান্তকারী অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমি দেশের মধ্যবিত্ত এখন দেখতে পাচ্ছে কী ধরনের ভবিষ্যৎ তাদের এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে। এ হেন অবস্থায় যখন পাশ্চাত্যের মানুষ তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত তখন তারা সহজ সমাধানের রাস্তা খুঁজছে। এমতাবস্থায় নাইজেল ফারাজের মতো রাজনীতিবিদ যিনি ব্রেক্সিট-এর পক্ষে এই বলে সওয়াল করলেন যে 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলেই বর্তমান আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে' বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি বলছেন যে 'আমাকে ভোট দিন কারণ আমি আমেরিকাকে আবার একটা মহান দেশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব'; এই ধরনের বক্তব্য মানুষকে আকৃষ্ট করছে। এই ধরনের 'পপুলিজম' দক্ষিণপন্থী রাজনীতির মধ্যে বেশি দেখা যায় কারণ দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ কোনও একটা বিশেষ তত্ত্বে অন্ধ বিশ্বাসী হয় না। অন্য দিকে, দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ তাত্ত্বিক দিক নিয়ে খুব বিশেষ ভাবনা চিন্তা করে না। তাই একজন দক্ষিণপন্থী পপুলিস্ট জনগণকে অতি সহজ সরল সমাধান দেবার ক্ষেত্রে একটু বেশি পটু হয় কারণ তার সমাধানসূত্র কোনও গভীর রাজনৈতিক তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে না। দক্ষিণপন্থী পপুলিস্ট সমাজের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং বিশুদ্ধ বাসনাকে সুড়সুড়ি দিয়ে সাফল্য পায়।

তা হলে আপনি বলছেন যে আজ বামপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতি তেমন ভাবে সফল হচ্ছে না কারণ এই অতি সরলীকৃত সমাধানসূত্র তারা আপাতত জনগণের সামনে তুলে ধরতে অপারগ। কিন্তু রাজনীতি তো একটা গতিশীল প্রক্রিয়া এবং সেটা সদা পরিবর্তনশীল। তাই দক্ষিণপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতি যদি মানুষকে আগামী দিনে তেমন সুরাহা দিতে না পারে যখন আর্থিক অসাম্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দাবিগুলো সামনে আসছে সে ক্ষেত্রে কি ভবিষ্যতে এক নতুন ধরনের বামপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতি আমরা দেখতে পাব?

আমার মনে হয় সেটা খুবই সম্ভব। এবং এক নতুন ধরনের বামপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতির ঝলক আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্নি স্যান্ডার্স-এর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে। গত দুই-তিন বছরে গ্রিস এবং স্পেনে যে ধরনের রাজনৈতিক ঝোঁক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাও এক ধরনের বামপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতি। কিন্তু যে ভুল ভারতের বামপন্থীরা এবং ইউরোপের বামপন্থী পপুলিস্টরা করছে, সেটা হল তারা জানে না ঠিক কাদের সঙ্গে তারা লড়াই করছে। তাদের বিরোধীপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে বামপন্থীদের খুব স্পষ্ট ধারণা নেই। ধরুন ব্রিটেনে জেরেমি করবিনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি। বর্তমান লেবার পার্টি হল অপেশাদার, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং বহু ক্ষেত্রে পুরাতনপন্থী। তারা অনেক বেশি বামপন্থী ভাবাদর্শের মানুষের মধ্যে প্রচার করছে এবং কেবল তাদেরকেই বেশি রাজনৈতিক উপদেশ দিচ্ছে যারা বহু দিন ধরে বামপন্থায় আস্থাশীল। অন্য দিকে; নতুন প্রজন্মের এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এই বামপন্থী ঘরানার সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন এবং তাদের মধ্যে সে রকম প্রচার কিন্তু করবিনের নেতৃত্বে লেবার পার্টিকে তেমন একটা করতে দেখা যাচ্ছে না। এ বার ভাবুন যাঁদের সঙ্গে বামপন্থীরা পাল্লা দিচ্ছেন তাঁরা হলেন অত্যন্ত দক্ষ, যাঁরা ইউরোপের দক্ষিণপন্থী দলগুলোর মধ্যে বিরাজ করেন। এই সব কুশলী ব্যক্তিরা আবার সেই সমস্ত শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন যারা আগ্রাসী বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের ধারক বাহক। যেমন ধরুন গোল্ডম্যান স্যাকস-এর মতো বড়ো লগ্নিপুঁজি সংস্থা অথবা বড়ো ব্যাঙ্কগুলো। যারা এই সংস্থাগুলো চালায় তারা বর্তমান পৃথিবী সম্পর্কে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল, তথ্যাভিজ্ঞ, সংগঠিত এবং পরিশ্রমী। এবং আমি মনে করি না একটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী দিয়ে এদেরকে হারানো সম্ভব। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ওদের সমকক্ষ হয়ে, ওদের মতো সমান দক্ষ হয়ে।

ঠিক বলেছেন। আচ্ছা আপনি ভারত নিয়ে দুটো বই লিখেছেন। কী ধরনের বিরোধ আপনি বর্তমান ভারতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন বিশেষ করে আর্থিক উদারীকরণের পরে?

হ্যাঁ আর্থিক উদারীকরণের পরবর্তী সময়ের ভারত নিয়ে আমি যে বই লিখেছিলাম সেটা পাঁচ বছর আগে বেরিয়েছিল। তখন কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতাসীন। সেই সময় অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল। কিন্তু আমি মনে করি যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চলছে তা এখনও পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক নীতির প্রশ্নে তেমন আগ্রাসী দক্ষিণপন্থী পথ অবলম্বন করেনি, যেমন অনেকে ভেবেছিলেন। অর্থনৈতিক প্রশ্নে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত বড়ো মাপের বিশেষ কিছু করেনি যেটা একজন গড়পড়তা দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকের কাছে লোকে আশা করে। যেমন ধরুন, তারা এয়ার ইন্ডিয়া-কে এখনও পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়নি এবং এ ক্ষেত্রে তারা ম্যাকিন্সের মতো পরামর্শদাতাদের উপেক্ষা করতেও পিছপা হয়নি। অন্য দিকে নব্যউদারবাদের আগ্রাসী নীতি তারা সেই ভাবে গ্রহণ করেনি যেটা অনেকে আড়াই বছর আগেও ভেবেছিল। অন্য দিকে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে বিমুদ্রাকরণের প্রক্রিয়া চলাকালীন পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী এমন কিছু কথা বললেন যা গত চার দশকে বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শোনা গিয়েছে। যেমন গরিব মানুষের কাছে ভর্তুকি পৌঁছনোর কথা। বঞ্চিত মানুষকে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকনের কথা। তাই পূর্বতন কংগ্রেস জমানার তুলনায় আর্থিক নীতির প্রশ্নে আমি বর্তমান কেন্দ্রীয়

এর পর চারের পাতায়

TIMES interact
শিক্ষা

১২টি দেশে সম্মানিত অধ্যাপক
অর্জুন চক্রবর্তী-র
তত্ত্বাবধানে
'ইনস্টিটিউট অফ্ এ্যাস্ট্রোলজিকাল সায়েন্স'-এর
ঢাকুরিয়া (কলকাতা) শাখায় বেসিক, ইন্টারমিডিয়েট ও এ্যাডভান্স সনাতন জ্যোতিষ ও চেম্বার প্র্যাকটিসের উপযুক্ত KP-র কোর্স এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে
আসন সীমিত
সত্বর যোগাযোগ 9635512407
facebook : Institute of Astrological Science

বুঝছে না লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে

দু'য়ের পাতার পর

সরকারের কোনও মৌলিক পরিবর্তন খুঁজে পাচ্ছি না।

ঠিক। তা হলে আপনি বলছেন যে ভারতে নব্যউদারবাদের এক নমনীয় চিত্র আমরা দেখছি। এক দিকে কিছু নব্যউদারবাদী নীতি গ্রহণের ফলে যেমন পুঁজির আদিম সঞ্চয় হচ্ছে এবং যার ফলে আর্থিক অসাম্য বাড়ছে আবার অন্য দিকে এই আর্থিক অসাম্য যেন জনগণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকে না ঠেলে দেয় সেই দিকে খেয়াল রেখে সরকার গরিব মানুষকে বিভিন্ন ধরনের দান-খয়রাত করছে। আপনার কী মনে হয়, কংগ্রেস জমানার মতো বিজেপির শাসনকালেও ওই একই ধরনের নীতি জারি থাকবে?

হ্যাঁ। সেটাই হচ্ছে। এবং সম্ভবত ইউপিএ জমানার অনেক আর্থিক নীতি তারা অনুকরণ করবে। এ ক্ষেত্রে আমি বলব যে বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিকড়ের মধ্যে ঢুকে আছে। এবং সেই সব সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এমনই মজ্জাগত ও স্বাভাবিক যে অনেক সময় লোকে বুঝতেই পারে না যে সরকার যে নীতি গ্রহণ করছে তা আসলে একটা বামপন্থী ধারা থেকে উদ্ভাবিত। তাই বিজেপির মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা বামপন্থী ও উদারবাদীদের সম্পর্কে গালমন্দ করেন। কিন্তু যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাঁরা আগের সরকারের থেকে আলাদা কিছু করেন না। আমি মনে করি, ভারতীয় রাজনীতিবিদদের একটা স্থায়ী লক্ষণ হল যখন তারা সরকারে ক্ষমতাসীন হয়ে যায় তখন এমন সব নীতি তারা গ্রহণ করে যেখানে রাষ্ট্র জনগণের যত্ন নেয়, অভিভাকত্ব করে, জনতাকে টাকা বিতরণ করে ইত্যাদি। অন্য দিকে, চিরাচরিত দক্ষিণপন্থীরা বলে এসেছে যে আপনার টাকা আপনি কী ভাবে খরচ করবেন সেটা রাষ্ট্র কেন ঠিক করবে? দক্ষিণপন্থীরা যেমন বলে থাকেন রাষ্ট্রের কি কোনও অধিকার আছে যে করদাতার টাকা সে জনতার মধ্যে বিলোবে? কিন্তু এই ধরনের কথা আমরা কোনও ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মুখে সে ভাবে শুনতে পাই না। আবার মনমোহন সিং ও নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক ভাষাকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় তাঁরা সব সময় বলতে ভালোবাসেন যে সরকার করদাতাদের টাকা তাদেরই কল্যাণে খরচ করে মহান দায়িত্ব পালন করছে। অথচ ওই টাকা তো করদাতারাই সরকারকে দিয়েছে।

সঞ্জয় হাজরা

এ ক্ষেত্রে আমার শেষ প্রশ্ন হবে যে বিজেপির বিরুদ্ধে কে বা কারা মিলে একটা মেরু তৈরি করবে যা আগামী দিনে এক শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নেবে? কংগ্রেস এখনও অনেক রাজ্যে বিজেপির প্রধান বিরোধী শক্তি। আবার শক্তিশালী কিছু আঞ্চলিক দল আছে যারা এখন বিজেপির বিরুদ্ধে। ২০১৯ সালে কোনও অ-বিজেপি সরকার গড়তে গেলে কংগ্রেসকে অন্তত একশো কুড়ি আসন পেরোতে হবে। আর সেটা তখনই সম্ভব যখন যে রাজ্যগুলিতে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি টক্কর সেই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস ভালো ফল করবে। এবং তা হলে আঞ্চলিক দলগুলোকে নিয়ে একটা বিকল্প সরকার ভাবা যেতে পারে। আপনি কী মনে করেন এই মুহূর্তে এমন পরিস্থিতি আছে যেখানে আগামী দুই বছরে কংগ্রেস পুনর্জীবিত হতে পারবে?

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ভাষ্যকার কংগ্রেসকে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় কংগ্রেসকে নস্যাৎ করা মস্ত বড়ো ভুল হবে। তার কারণ, কংগ্রেসের শিকড় ভারতের মাটিতে এমন গভীর যে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা বারংবার দেখা গেছে। যদি বিজেপি পরের দু'বছরে কয়েকটা সাংঘাতিক ভুল করে, তা হলে অবাক হব না যদি কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি এবং নীতীশ কুমার মিলে একটা বিজেপি-বিরোধী জোট করে। ভারতের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোট হওয়ার অনেক নজির আছে। কিন্তু বিজেপি-বিরোধী শক্তিগুলো তখনই একত্রিত হবে যদি নিকট ভবিষ্যতে বিজেপি বড়ো মাপের কিছু ভুল করে। অন্য দিকে রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর মতো 'ক্যারিশমাটিক' নন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ২০১৯ সালে তাঁর পিছনে বিজেপি-বিরোধী শক্তি একত্রিত হবে না। ■